Vol. 4 | No. 2 | 1960

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীন

Volume	4
Issue	2
Year	1960
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Anisuzzaman
Published online	December 16, 1960
DOI	10.62328/sp.v4i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v4i2.3
Pages	77-106
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরুদ্দীন

আনিসুজ্জামান

খৃষ্টান পাদরীদের কাছে বাংলা সাহিত্যের ঋণ অনেক।

ষোড়শ শতাব্দীতেই পর্তুগীজ ধর্মপ্রচারকেরা বাংলা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত এই পাদরীরা সপ্তদশ শতাব্দীতে রীতিমতো কয়েকটি ধর্মপ্রচারকেন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন, ঢাকা যার মধ্যে ছিল অন্যতম।[১] এঁদেরকে অনুসরণ করে সমগ্র বাংলায় খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হন ইংরেজ পাদরীরা ঃ ড্যানিশ উপনিবেশ শ্রীরামপুরে প্রোটেস্টান্ট মিশন-প্রতিষ্ঠা এক্ষেত্রে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কীর্তি।

ধর্মপ্রচারের প্রয়োজনে খৃষ্টান প্রচারকেরা বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করেন এবং এভাবে এঁদের হাতে বাংলা গদ্যের কার্যকর ব্যবহার শুরু হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভূষণার ধর্মান্তরিত রাজকুমার দোম আন্তনিওর লেখা 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ'- এর মধ্যে সর্বপ্রাচীন রচনা। পর্তুগীজ পাদরী মানোএল দা আস্সুম্প্সাওঁ-প্রণীত 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' (রচনা ১৭৩৪, প্রকাশ লিসবন, ১৭৪৩) বাংলার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। একই বছরে তাঁর রচিত বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ ও বাংলা-পর্তুগীজ শব্দকোষ লিসবনে প্রকাশিত হয়।[২]

প্রথম যুগের পাদরী লেখকদের মধ্যে সোনারগাঁও শ্রীপুরের জেস্যুইট পাদরী ফের্নান্দেস্ (ষোড়শ শতাব্দী), সোসা (ঐ), সান্তচ্চি, গোমেশ, সরয়বা (সপ্তদশ শতাব্দী), বেরবিয়ের (অষ্টাদশ শতাব্দী) প্রভৃতির বাংলা

১। Sushil Kumar De, *A History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* (Calcutta : University of Calcutta, 1919), Ch. II দ্রষ্টব্য।

২। সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (তৃ-স ; কলিকাতা : মর্ডান বুক এজেন্সী, ১৩৫৬), পৃ ১০-১৪ দ্রষ্টব্য।

রচনার নিদর্শন না পেলেও, তার খবরাখবর পাওয়া গেছে।[১] রেভারেণ্ড বেণ্টোর লেখা 'প্রার্থনামালা' ও 'প্রশ্নমালা' বলে দুটি বইয়ের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়।[২]

শ্রীরামপুর মিশনের পাদরীদের মধ্যে উইলিয়ম কেরীর (১৭৬১-১৮৩৪) নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। প্রধানতঃ তাঁরই উদ্যোগে ও পরিশ্রমে বাইবেলের সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ (১৮৯১) মিশন থেকে প্রচারিত হয়েছিল। বাংলা গদ্যের বিকাশের ক্ষেত্রে কেরীর ভূমিকা স্ফুটতর হবার সুযোগ পেল ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠায়। পরবর্তী বৎসরে এই কলেজের বাংলা বিভাগের উদ্বোধন হলে কেরী এর অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁর অধীনে দুজন পণ্ডিত ও দুজন সহকারী নিযুক্ত হলেন—যদিও প্রথম বৎসরে বাংলা বিভাগে ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র ছয়।[৩] ইংরেজীতে বাংলা ব্যাকরণ রচনা (১৮০১) এবং বাংলা-ইংরেজী অভিধান সংকলন (১৮১৮-২৫) করা ছাড়াও কেরী হয়তো কিছু কিছু বাংলা লিখেছিলেন — কিংবা হয়তো লেখেন নি। তবে বাংলা গদ্যের এই উদ্যোগ পর্বে তিনি এবং তাঁর সহকর্মী মার্শম্যান, ওয়ার্ড, এলার্টন প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক বাংলা গদ্য রচনার ক্ষেত্রে পথিকৃতের কাজ করেছিলেন।[৪] প্রত্যক্ষতঃ তাঁদের প্রেরণাতেই রামরাম বসু, গোলকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার প্রমুখ লেখক বাংলা গদ্যের ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন।

২

বাংলা সাহিত্যের ছাত্রদের কাছে খৃষ্টান পাদরীরা তাই স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন তাঁদের গদ্যরচনার জন্যে। আমাদের কাছে এঁরা কেবল লেখকরূপেই পরিচিত — ধর্মপ্রচার যে এঁদের মুখ্য অভিপ্রায় ছিল, একথা আমরা বিস্মৃত

১। গোপাল হালদার, বাঙ্গলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২ : (কলিকাতা : এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ, ১৩৬৫) ৭১।

২। যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় (সম্পাদিত), সাহিত্য পঞ্জিকা (কলিকাতা, ১৩২২), পৃ ১৬৪।

৩। Brajendranath Banerji, *Dawn of New India* (Calcutta : M. C. Sarker & Sons., 1927), p 105.

৪। De, *Op. cit.* Ch. IV দ্রষ্টব্য।

হতে পেরেছি। আর তাই একথাও ভুলে যাওয়া সহজ হয়েছে যে, এদেশের ভাষাকে এঁরা যত সহজে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন, এদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্ম ও বিশ্বাসকে এঁরা ঠিক ততখানি ঘৃণা করতেন।

অনেকখানি এই মনোভাবের জন্যেই এদেশে ধর্মপ্রচারকার্যে খৃষ্টান পাদরীরা দীর্ঘকাল পর্যন্ত সরকারী সাহায্যলাভ থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁদের প্রতি সরাসরি বিরূপতা প্রকাশ করতেও কুণ্ঠিত হন নি। প্রথম যুগে কোম্পানীর এলাকায় কোন মিশনারীকে বসতি স্থাপন করতে দেওয়া হত না। তাই ১৭৯৩-তে কেরী যখন কলকাতায় আসেন, মিশনারী বলে সেখানে তিনি নামতে পারেন নি। তাঁকে বসতি স্থাপন করতে হয়েছিল সুদূর মালদহে — তাও আবার ড্যানিশ পতাকার আশ্রয়ে। এমন কি, তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হবার পরও পাদরীদের প্রতি কোম্পানীর মনোভাব সুপ্রসন্ন হয় নি। এর কারণ ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে ফার্কুহারের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য ঃ

> In order to understand their attitude, we must realize that their [the Company's] only object was trade, and that it was purely for safeguarding of their trade that they had interfered with the politics of the land. In consequence, they regarded themselves as in every sense the successors of the old rulers and heirs to their policy and method, except in so far as it was necessary to alter things for the sake of trade. .. the Government believed it to be necessary, for the stability of their position, not merely to recognize the religions of the people of India, but to support and patronize them as fully as the native rulers had done, and to protect their soldiers from any attempt to make them Christians.[১]

কোম্পানীর এলাকায় মিশনারীদের বসতিস্থাপন সম্পর্কিত নিষেধ তুলে দেওয়া হয় ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের সনদে।[২] এর ফলে, খৃষ্টান পাদরীরা এদেশবাসীর ধর্ম-

১। J. N. Farquhar, *Modern Religious Movements in India* (London : Macmillan & Co. Ltd.. 1924) pp 8-9.

২। *ibid.*, pp 10-11.

বিশ্বাসকে আঘাত করবার ক্ষমতাটা বেশ ব্যাপকভাবে লাভ করলেন। তাঁদের এ ধরণের প্রচারণা যে একজন বিদেশী খৃষ্টানকেও কতখানি ব্যথিত করে তুলেছিল, তার পরিচয় আছে কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের কাছে লেখা লর্ড মিণ্টোর একটি পত্রে ঃ

> Pray, read especially the miserable stuff addressed to the Gentoos in which, without one word to convince or to satisfy the mind of the heathen reader, without proof or argument of any kind, the pages are filled with hell fire and hell fire and still hotter fire, denounced against a whole race of men for believing in the religion which they were taught by their fathers and mothers and the truth of which it is simply impossible it should ever have entered into their minds to doubt. Is this doctrine of our farth ?[১]

৩

এ দেশবাসীর অনেক কুসংস্কার ভেঙে দেবার জন্যে বাইরের আঘাতের প্রয়োজন ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সেটা এই ভয়ংকর মূর্তিতে না এলেও পারত। প্রকৃতপক্ষে, এদেশের সামাজিক অগ্রগতি মিশনারীদের বিরূপ প্রচারে ত্বরান্বিত হয় নি, সেই কাজ সম্পন্ন হয়েছে পাশ্চাত্য শিক্ষার ও ভাবাদর্শের প্রভাবে। আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে মিশনারীদের কর্মপ্রচেষ্টা অবশ্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়।

এই সহানুভূতিহীন আক্রমণকে পর্যুদস্ত করতে না পারলে কিন্তু এ দেশবাসীর পক্ষে কুসংস্কারগুলোকে নিজের পরমপ্রিয় ঐতিহ্য বলে আঁকড়ে থাকার চেষ্টা করা স্বাভাবিক ছিল। অন্যপক্ষে, এই ধরণের আক্রমণকে নীরবে মেনে নেবার মধ্যেও একটা হীনমন্যতার পরিচয় আছে। তাই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত করার আবশ্যকতা সেদিন ছিল। সেক্ষেত্রে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩)। পাদরীদের কর্মপদ্ধতির নিন্দা করে তিনি বলেন ঃ

১। Edward Thompson and G. T. Garratt, *Rise and Fufilment of British Rule in India* (London : Macmillan & Co. Ltd., 1935), p 247 এ উদ্ধৃত।

> To introduce a religion by means of abuse and insult, or by affording the hope of worldly gain, is inconsistent with reason and justice. If by the force of argument they can prove the truth of their own religion and the falsity of that of Hindus, many would of course embrace their doctrines, and in case they fail to prove this, they should not undergo such useless trouble, nor tease Hindus any longer by their attempt at conversion. [১]

রামমোহন তাঁর প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনে হিন্দু ধর্মের কাঠামোর মধ্যে খৃষ্টান ও মুসলমানী আদর্শকে অনেকখানি জায়গা দিতে পেরেছিলেন। কেশবচন্দ্র অবশ্য খৃষ্টান প্রভাবকে অনেক বেশী করে আত্মস্থ করেন। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যীশুখৃষ্টের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে তিনি কুণ্ঠিত হন নি, যেমন 'ব্রাহ্মরা হিন্দু নয়' —এ উক্তি করতেও তিনি দ্বিধা বোধ করেন নি। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মেরা এতখানি স্বীকার করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, খৃষ্টানদের আক্রমণাত্মক প্রচারণায় ব্যথিত ও রুষ্ট হয়ে এর প্রতিবাদকল্পে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের সঙ্গেও তাঁরা আপোষ করেছিলেন।[২] তবে পাদরীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বিশেষ করে সনাতন হিন্দু সমাজের মুখপাত্রেরাই, প্রথম যুগে যাঁরা 'ধর্মসভা' স্থাপন করে আশ্রয় খুঁজেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে পাদরী হেস্টি ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তর্কযুদ্ধ এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা,' কলকাতার 'সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা' এবং প্রথমটির প্রেরণায় 'ন্যাশনাল' নবগোপালের 'হিন্দু মেলা' এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক আয়োজন।

৪

খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের আক্রমণ সবটুকুই যে হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল, তা নয়। ইসলামের বিরুদ্ধেও তাঁরা বেশ সচেতন আক্রমণ চালিয়েছিলেন— বক্তৃতা এবং বইপত্র রচনার মাধ্যমে। মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে কতকগুলো বইপত্র তাঁরা বিশেষ করে রচনা করেছিলেন, লণ্ড

১। Rammohan Ray, *Works* (Allahabad: The Panini Office, 1910), p146.

২। কাজী আবদুল ওদুদ, বাংলার জাগরণ (কলিকাতা: বিশ্বভারতী, ১৩৬৩), অধ্যায় ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য।

সাহেবের পুস্তক তালিকায় তার অনেকগুলোর নাম আছে। যেমন, Prophet's Testimony of Christ (১৮২৯), Muhammedan Ceremonies এবং Reasons for not being a Mussalman বা মুসলমান ধর্ম্মের অপ্রমাণ্য কথন (১৮৩৭)। আরবী ফারসী শব্দবহুল বাংলা ভাষায় রচিত কাব্যসমূহ মুসলমান সমাজে জনপ্রিয় হওয়ায় সেই ভাষায়ও তাঁরা কোন কোন বই লিখেছিলেন।[১] সাধু ভাষায় তাঁদের রচনার নমুনা, জে. লঙ প্রণীত 'মহম্মদের জীবনচরিত্র' (১৮৫৫)।[২] এর থেকে অংশবিশেষ উদ্ধার করলেই অনুভব করা যায় এঁদের আক্রমণের তীব্রতা ঃ

> মক্কানগরে ২০,০০০ বিংশতি সহস্র লোক বাস করে। হিন্দুদিগের পক্ষে যেরূপ কাশী, মুসলমান লোকদিগের সেরূপ মক্কা; অনেক ভিক্ষুক সেখানে বাস করিয়া অনায়াসে কালক্ষেপ করে, এ কারণ মক্কাকে ভিক্ষুকদিগের স্বর্গ বলে। [পৃ ১১]
>
> মহম্মদ সের্জিয়স এবং উদাসীন নেষ্টোরিয়ানদের হইতে খ্রীষ্ট ধর্মসম্বন্ধীয় যে বিদ্যা পাইয়াছিলেন, তাহাই উত্তরকালে কোরান রচনায় তাঁহার উপকারজনক হইল। [পৃ ৩৬]
>
> বিশেষতঃ সে [খাদিজা] ভোজের সময় আপন পিতাকে মদ্য দ্বারা মত্ত করিলে তিনি নিজ কন্যা খাদাইজাকে মহম্মদের সহিত বিবাহ দিলেন। [পৃ ৩৮]
>
> [ক্রীতদাস-দাসীরা] তাঁহাকে [মুহম্মদকে] মৃগীরোগে পীড়িত দেখিয়া ঈশ্বরাবির্ভূত জ্ঞান করিত। [পৃ ৪২]
>
> দেখ, যীশুখ্রীষ্ট পাপিদের হইতে পৃথক ও নির্দোষ এবং পবিত্র; মহম্মদ কামুক ও সাংসারিক সুখে আসক্ত ছিলেন। [পৃ ৫৫]

কিন্তু বাঙালী মুসলমানের মধ্যে তখন এমন কেউ ছিলেন না, যিনি এর প্রতিবাদ করতে পারেন।

১। J. Long, *A Descriptive Catalogue of Bengali Works* (Calcutta: Sanders, Cones & Co., 1855).

২। কলিকাতা: সত্যার্ণব প্রেস (ক্রিষ্টান ট্রাক্ট অ্যাণ্ড বুক সোসাইটি), ১৮৫৪। আখ্যাপত্রে লেখকের নাম নেই। লঙের ক্যাটালগে গ্রন্থকারের নাম আছে। কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত কপিতে হাতের লেখায় "To the Asiatic Society from the author" কথাগুলির পর স্বাক্ষর আছে "J. Long."

তার অর্থ এই নয় যে, একালে মুসলমানদের মধ্যে ধর্মজীবন নিয়ে কোনরকম চিন্তা-ভাবনা হয়নি বা আন্দোলন গড়ে ওঠে নি। ইংরেজ আমলের প্রথম একশ' বছরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যেসব ধর্মান্দোলন দেখা দিয়েছিল, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানদের জীবনে আদি ইসলামের আদর্শসমূহের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং বাহ্যিকপ্রভাব-জনিত সর্বপ্রকার বিকার থেকে ইসলামকে মুক্তিদান। এই সংস্কার-আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অভিব্যক্ত হয় দিল্লীর শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্‌র (১৭০৩-৬২) রচনায় এবং তাঁর পুত্রদের প্রচারিত আদর্শে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রায়বেরিলীর সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১) যে সংস্কারান্দোলন উপস্থিত করেন, তা ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত (যদিও এই নামকরণের যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ আছে)। এই আন্দোলনকারীরা প্রথমে শিখদের সঙ্গে এবং পরে— পাঞ্জাব ইংরেজদের অধিকারভুক্ত হলে— ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। এই ইংরেজবিরোধী মনোভাব বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করে সৈয়দের মৃত্যুর পর তাঁর শিষ্য এনায়েত আলীর নেতৃত্বে। বাংলা দেশে এই আন্দোলন বেশ খানিকটা প্রভাব বিস্তার করেছিল এবং ওয়াহাবীদের ইংরেজবিরোধী দলটি বাঙালী স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়েই গড়ে উঠেছিল।[১] অনেকটা একই ধরণের ধর্মীয় সংস্কারান্দোলন স্বতন্ত্রভাবে বাংলা দেশেও গড়ে ওঠে তিতুমীর (মৃত্যু ১৮৩১) ও হাজী শরিয়তউল্লাহ্‌র (১৭৮০-১৮৪০) নেতৃত্বে। শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হবার ফলে এই দুটি আন্দোলনও দমিত হয়। এঁরা সকলেই ধর্মকে তার আদি বিশুদ্ধতায় ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলেন, একথা মনে রাখা দরকার।

সিপাহী অভ্যুত্থানের কালে এবং পরবর্তী সময়েও ওয়াহাবীদের ভূমিকা সক্রিয় ছিল। তবে এই অভ্যুত্থানের পরই সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁ (১৮১৭-৯৮) ('স্যার' তখনও হন নি) সর্বভারতীয় মুসলমানের নেতারূপে দেখা দেন এবং শাসকশ্রেণীর সঙ্গে মিতালীবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মুসলমান সমাজকে আধুনিক শিক্ষাগ্রহণ করে বৈষয়িক উন্নতিসাধনের আহ্বান জাগান। খৃষ্টান পাদরীদের বিকৃত প্রচারণা সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম হেতু, একথা তিনি স্বীকার করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান

১। E. Rehatsak, "The History of the Wahhabys in Arabia and in India", *JBRAS*, XIV, 355.

ইংরেজ ও মুসলমান ভারতীয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্যেও অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন। খৃষ্টধর্ম ও আধুনিক শিক্ষার প্রতি উদার মনোভাবের জন্যে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজের কাছ থেকে যথেষ্ট লাঞ্ছনাও তিনি পেয়েছেন।[১] কিন্তু পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের আলোকে ইসলামের ব্যাখ্যা ও পুনর্গঠনে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁর — এবং সেই সঙ্গে স্যার সৈয়দ আমীর আলীর (১৮৪৯-১৯২৮) — অবদান অবিস্মরণীয়। নবযুগের এই সমাজ-সংস্কারকদের চিন্তাধারা প্রকাশের মাধ্যম ছিল উর্দু ও ইংরেজী ভাষা। অতএব, বাঙালী মুসলমানের কাছে তা খুব ব্যাপকভাবে পৌঁছতে পারে নি। হিন্দুধর্মের সাহচর্যে এবং সুফী প্রভাবের ফলে বাংলায় প্রচলিত ইসলামধর্মে নানা বিকৃতি প্রবেশলাভ করেছিল।[২] ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাব এই বিকৃতিটুকুকে অনেকখানি চিনিয়ে দেয়, কিন্তু তাতে সবটুকু কাজ হয় নি। খৃষ্টধর্মের প্রচারকদের আক্রমণ আবার নতুন সমস্যারূপে দেখা দিয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের কেউ কেউ — যেমন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন (১৮৩৫-১৯১৮) — ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ অধ্যয়ন করেছিলেন এবং কোরআন হাদিসের অনুবাদ করে ইসলামকে জানতে বুঝতে অনেকখানি সাহায্য করেছিলেন। তবে ইসলামের ধর্মমতের সঙ্গে সুফী অধ্যাত্মতত্ত্বের পার্থক্য তাঁরা লক্ষ্য করেন নি। তাই কোরআন-হাদিসের সঙ্গে সঙ্গে গিরিশচন্দ্র অনুবাদ করেছিলেন 'তাযকিরাতুল আউলিয়া'।

পলাশী-যুদ্ধের পরবর্তী একশ' বৎসরে আধুনিক শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে নানাকারণে বাঙালী মুসলমানের যোগাযোগ স্থাপিত হয় নি। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহ্‌মদ খাঁর নেতৃত্বে এবং বাংলা দেশে নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-৯৮) ও সৈয়দ আমীর হোসেন প্রভৃতির চেষ্টায় এই যোগাযোগ স্থাপিত হল নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যেও মুসলমান লেখকদের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে

১। G. F. I. Graham, *The Life and Work of Sir Syed Ahmed Khan* (2nd edn; London: Hodder & Stroughton, 1909) দ্রষ্টব্য।

২। এই বিকৃতির পরিচয় পেতে হলে Murray T. Titus, *Indian Islam* (London: Oxford University Press, 1930) এবং মুহম্মদ এনামুল হক, বঙ্গে সুফী প্রভাব (কলিকাতা: মোহসীন এণ্ড কোং, ১৯৩৫) দ্রষ্টব্য।

এই সময়েই। একালের মুসলমান লেখকেরা সকলেই ধর্মবিষয়ে কিছু না কিছু লিখেছেন। এ সত্ত্বেও এঁদেরকে দুটি ভাগে ফেলে দেখা যেতে পারে। মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১১), মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩) ও কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২) — এঁরা প্রধানতঃ সৃষ্টিধর্মী লেখক। ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ধর্মনীতি ও জীবনসাধন প্রণালী ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩), পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দীন আহমদ মশহাদী (১৮৫৯-১৯১৯) ও মেয়ারাজউদ্দীন আহমদের নাম স্মরণীয়। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা দু খণ্ড 'এসলাম তত্ত্ব' (১৮৮৫-৮৬) এবং আবদুর রহিমের সুবৃহৎ 'হজরত মহম্মদের (দঃ) জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭) এ ক্ষেত্রে পথিকৃতের মর্যাদা লাভ করতে পারে।

মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ এবং মোহাম্মদ জমিরউদ্দীন বিদ্যাবিনোদের নাম এই সঙ্গে এসে পড়ে। পূর্বোক্ত লেখক-চতুষ্টয়ের সঙ্গে এঁদের উদ্দেশ্য অভিন্ন, তবে পার্থক্য এই যে, ওঁরা প্রধানতঃ লেখক আর মেহেরুল্লাহ্ ও জমিরউদ্দীন প্রধানতঃ ধর্মপ্রচারক। তাঁদের বিশেষ গৌরব এই যে, খৃষ্টান পাদরীদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে তাঁরা এদেশের মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরণ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ধর্মপ্রচার করতে যেয়ে কিছু গ্রন্থাদি তাঁরা রচনা করেছিলেন, তাই সেযুগের লেখকদের সঙ্গে তাঁদের নামটিও সহজে উচ্চারিত হয়ে থাকে।

দুই

দেখা যাচ্ছে, মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র তিনটি জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথমটি তাঁর প্রধানতম সহকর্মী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীনের লেখা 'মেহের-চরিত' (কলিকাতা, ১৩১৫)। প্রায় একই সময়ে বের হয় মোহাম্মদ আসিরউদ্দীন প্রধান-রচিত 'মেহেরুল্লা-জীবনী' (জলপাইগুড়ি, ১৯০৯)। তৃতীয়টি অনেক পরবর্তী রচনা: শেখ হবিবর রহমান সাহিত্যরত্নের 'কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা' (কলিকাতা, ১৯৩৪)।

মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনী-বর্ণনায় আমি বিশেষভাবে অবলম্বন করেছি 'মেহের-চরিত' আর 'কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা': শেষোক্ত বইটির অনেকখানি বিষয়বস্তু

অবশ্য প্রথমোক্ত বইটির থেকে নেওয়া। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত 'মেহেরুল্লা-জীবনী'র কিছু অংশ নকল করে এনেছেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ঃ তাঁর সৌজন্যে আমি সেটাও ব্যবহার করতে পেরেছি।

২

যশোর জেলার ঘোপ গ্রামে এক নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ১০ই পৌষ তারিখে (১৮৬১ খৃঃ) মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তিনি তাঁর পিতা মুন্শী ওয়ারেসউদ্দীনকে হারান। পিতৃহারা বালকের লেখাপড়ার সুযোগ বিশেষ হয় নি; 'বোধোদয়' পর্যন্ত পড়ে লেখাপড়ার প্রথম পর্ব তিনি সাঙ্গ করেছিলেন। তেরো-চোদ্দ বছর বয়সে হঠাৎ গৃহত্যাগ করেন তিনি। তারপর কয়ালখালি ও করচিয়া গ্রামে দুজন সহৃদয় ব্যক্তির আশ্রয়ে বছর ছয়েক থেকে আরবী ও ফারসী ভাষাশিক্ষার সুযোগ পান। ১৮৮১র দিকে তিনি খোজারহাট গ্রামে আসেন এবং বাংলা ভাষা শিক্ষার ভিত্তিটা এখানেই পাকা করে নেন। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে তিনি যা শেখেন, তা হচ্ছে সেলাইয়ের কাজ।

শিক্ষানবিশী পর্বের শেষে যশোর শহরেই তিনি একটা দর্জির দোকান খুলে বসেন। অনতিবিলম্বে 'সাহেব বাড়ী'র দর্জি হিসেবেও নিযুক্ত হন। সাহেবদের আনুকূল্যে যশোর জেলাবোর্ডে একটি কর্মও তিনি লাভ করেছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পর সেই পদ ত্যাগ করে সেলাইয়ের কাজেই পুনরায় প্রবেশ করেন। তাঁর দোকানের সামনেই মিশনারীরা ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করে বক্তৃতা করতেন। নির্বিকারচিত্তে এইসব বক্তৃতা শ্রবণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি ঃ এঁদের বিভ্রান্তিকর প্রচারণায় ধর্মসংক্রান্ত প্রশ্নে তাঁর মন আকুল হয়ে ওঠে। পাদ্রী ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দবাবুর প্রচার শুনে তাঁর মনেও ইসলাম সম্পর্কে অনাস্থা ও খৃষ্টধর্মে বিশ্বাস জন্মায়, এমন কি, তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করবেন বলেও স্থির করে ফেলেন।[১] এমনি সময়ে হাফেজ নিয়ামতউল্লাহ্-রচিত 'খৃষ্টান ধর্মের ভ্রষ্টতা' এবং পাদ্রী ঈশানচন্দ্র মণ্ডল (যিনি ইসলাম গ্রহণ করে মুন্শী

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, মেহের-চরিত (কলিকাতা ঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৫), পৃ ৮। লেখকের কাছে ১৮. ১. ১৩০৪ তারিখে লেখা পত্রে মেহেরুল্লাহ্ এই কাহিনী বর্ণনা করেছেন। দ্র ঐ, পৃ ৪২-৪৩।

মোহাম্মদ এহ্‌ছানউল্লা নামে পরিচিত হন) প্রণীত 'ইঞ্জিলে হজরত মোহম্মদের খবর আছে' পাঠ করে তিনি স্বধর্মে নিষ্ঠ থাকার যথেষ্ট প্রেরণা পান। মহীশূর থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'মনসুরে মোহাম্মদী' পত্রিকা এবং খৃষ্টধর্মের আক্রমণ পর্যুদস্ত করার উদ্দেশ্যে রচিত কয়েকটি উর্দু পুস্তক পাঠ করার ফলেও তিনি বেশ শক্তি লাভ করেন। এবারে মেহেরুল্লাহ্ খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। তিনি প্রথমে পাদ্রীদের বক্তৃতাসভায় কিছু কিছু বাদ প্রতিবাদ করতেন; তারপর হাটে হাটে মিশনারীদের বক্তব্যের অসারতা প্রমাণ করে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। প্রচারক জীবনের এই প্রথম পর্যায়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ কাসেম ও মুনশী গোলাম রব্বানী।

কিছুকাল পর ব্যবসায়ী জীবন ত্যাগ করে মেহেরুল্লাহ্ পুরোপুরি প্রচারক-জীবন গ্রহণ করেন। এ সময়ে তিনি যশোরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর একটি বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতা থেকে শেখ আবদুর রহিম, মেয়রাজউদ্দীন আহমদ ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদকে যশোরে নিয়ে যান। এরপরেই তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে, তা হচ্ছে, মিশনারী জন জমিরুদ্দীনকে ইসলামধর্মে পুনরায় দীক্ষাদান।

৩

শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর 'ধোঁকাভঞ্জন' (কলিকাতা, ১৩২৩) বইটিতে জমিরুদ্দীন আত্মপরিচয় দিয়েছেন, তাঁর অন্যান্য বইতেও অল্পস্বল্প ব্যক্তিগত সমাচার আছে। এ থেকে তাঁর জীবনকাহিনী সম্পর্কে একটা ধারণা করে নেওয়া যায়। তাঁর পিতা শেখ মোহাম্মদ আমিরুদ্দীন নদীয়া জেলার গাঁড়াডোব গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শৈশবে গ্রাম্য পাঠশালা ও মক্তবে বিদ্যাচর্চার পর তিনি কৃষ্ণনগর নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন। এখানে তিনি বাংলা ও সংস্কৃতসমেত নর্মাল শ্রেণীর পাঠ্যতালিকা সম্পূর্ণ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মিশনারীরা তাঁকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেন। এরপর তিনি ক্রমান্বয়ে কলকাতার সি, এম, এস, হাইস্কুল, এলাহাবাদের সেণ্ট পলস ডিভিনিটি কলেজ ও কলকাতার সি, এম, এস, ক্যাথিড্রাল মিশন ডিভিনিটি কলেজে দীর্ঘকাল খৃষ্টধর্মতত্ত্ব এবং সংস্কৃত, আরবী, গ্রীক ও হিব্রু ব্যাকরণ ও সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি মিশনারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে H. G. R. ডিগ্রী লাভ করেন।[১]

১। পরিশিষ্ট গ দ্রষ্টব্য।

এরপর জন জমিরুদ্দীনকে দেখতে পাই খৃষ্টধর্মপ্রচারকরূপে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মাসিক 'খ্রীষ্টীয় বান্ধব পত্রিকা'য়[১] "আসল কোরাণ কোথায়?" নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর মূল বক্তব্য ছিল এই যে, হজরত মুহম্মদের (দঃ) সময়ে কোরআন সংকলিত হয় নি; হজরত আবু বকর ও হজরত ওসমান সে কাজ সম্পন্ন করেন। ওসমান আবার সেকালে প্রচলিত কোরআন দগ্ধ করেছিলেন; তাই, কোরআন শরীফ বলে বর্তমানে যা প্রচলিত আছে, তা মূল কোরআন নয়। এই প্রবন্ধের উত্তরে সাপ্তাহিক 'সুধাকর' পত্রিকায়[২] মেহেরুল্লাহ্ "ঈসায়ী বা খৃষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন" নামে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ (২০ ও ২৭ চৈত্র, ১২৯৯; ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩০০) লিখে জন জমিরুদ্দীনের যুক্তি খণ্ডন করেন। জমিরুদ্দিন এই প্রবন্ধের প্রত্যুত্তর দেন 'সুধাকরে' একটি ছোট প্রবন্ধ লিখে (২৩ বৈশাখ, ১৩০০), যার জবাবে 'সুধাকরে' মেহেরুল্লাহ্ লেখেন "সর্ব্বত্রই আসল কোরআন" নামে একটি প্রবন্ধ (১৭ আষাঢ়, ১৩০০)। এরপর জমিরুদ্দীন আর তর্কে প্রবৃত্ত হন নি। বরঞ্চ, পরে তিনি স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের পরামর্শে ১৩০৪ সালের প্রথম দিকে তিনি মেহেরুল্লাহ্‌র কাছে চিঠি লিখে ইসলাম-প্রচারকার্য সম্পর্কে আলাপ করেন। ঐ বছর ১১ই ফাল্গুন তাঁদের উভয়ের সাক্ষাৎ হয়। অনতিবিলম্বে ইসলাম-প্রচারকার্যে জমিরুদ্দীন হয়ে ওঠেন মেহেরুল্লাহ্‌র প্রধান সহকর্মী।

৪

মেহেরুল্লাহ্‌র প্রচারক-জীবনের সূত্রপাত-কালে কলকাতায় কতিপয় মুসলমান লেখক ইসলাম-সম্পর্কিত তত্ত্ব ও তথ্যপ্রচারের উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধভাবে লেখনী ধারণ করেন। এঁদের নামোল্লেখ আগেই করেছি। 'সুধাকর' ছিল এঁদের মুখপত্র। মেহেরুল্লাহ্‌র সঙ্গে অনতিবিলম্বে এঁদের যোগাযোগ হয় এবং তাঁর রচনাদিও এতে প্রকাশিত হতে থাকে। সাপ্তাহিক 'সুধাকর' ও মাসিক

১। প্রথম প্রকাশকাল: বৈশাখ ১২৯৬। "খ্রীষ্টধর্ম্ম-বিষয়ক সচিত্র মাসিকপত্র। সম্পাদক— জি, এইচ, রুজ (Rouse),।"—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক পত্র, ২ (দ্বি-স; কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৫৯): ২৯।

২। প্রথম প্রকাশকাল: কার্ত্তিক ১২৯৬ (১৮৮৯)।— ঐ, ২: ৫৭। সম্পাদক: [শেখ] আবদুর রহিম। দ্রষ্টব্য রাজবিহারী দাস, "বঙ্গীয় সংবাদপত্র" সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৪; সমাদ্দার ও রায়, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৭।

'মিহির'[১] পত্রিকা একত্রিত হয়ে যখন শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর' রূপে প্রকাশিত হতে থাকে (১৮৯৬-১৯০৪), তখন মেহেরুল্লাহ্‌ এই পত্রিকার গ্রাহকসংগ্রহের জন্য সার্থক প্রচেষ্টা চালান। 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা'র লেখক এরকম ধারণা দিয়েছেন যে, সুধাকর-দলের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ পরিচয় হয় 'মিহির ও সুধাকরে'র যুগেই ঃ কিন্তু তার বহু পূর্বেই যে এঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল, তা বোঝা যায় 'মেহের-চরিত' থেকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ১৩১২ সালে প্রকাশিত 'সোলতান' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মেহেরুল্লাহ্‌ ও জমিরুদ্দীনের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল।

মেহেরুল্লাহ্‌র সাংগঠনিক প্রচেষ্টার প্রথম পরিচয় পাই যশোরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা'র প্রতিষ্ঠায়। পরে খান বাহাদুর বদরুদ্দীন হায়দর ও খান বাহাদুর নুর মুহম্মদ জাকারিয়া প্রমুখ সমাজহিতৈষীর সহায়তায় তিনি 'নিখিল ভারত ইসলাম-প্রচার সমিতি' গঠন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইসলামের বাণী পৌঁছে দেওয়া। এই আন্দোলনে তিনি বিশেষভাবে সহায়তা লাভ করেন ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের।

১৩১০ সালে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনের ব্যাপারে মেহেরুল্লাহ্‌ সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৩১৩ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগ দেন। এই সম্মেলনের শেষেই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের জন্ম হয়। এই সময়ে সারা দেশে বঙ্গভঙ্গ-রদের আন্দোলন চলছিল ঃ মেহেরুল্লাহ্‌ যথাশক্তি এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন।

৫

জমিরুদ্দীনকে সঙ্গে পেয়ে মেহেরুল্লাহ্‌র প্রচার-আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠল। নিজেদেরকে 'ইসলাম ধর্মপ্রচারক' আখ্যা দিয়ে তাঁরা এবার বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়াতে থাকেন। এই সভাসমিতির কিছু কিছু বিবরণ সমকালীন সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। এরকম একটি বিবরণ এখানে উদ্ধৃত করি ঃ

১। প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৮৯২। সম্পাদক ঃ শেখ আবদুর রহিম।

... ২৮শে বৈশাখ [১৩০৮] রবিবার নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহকুমাস্থ ছাত্র সমিতির ৫ম অধিবেশন উপলক্ষে বিরাট সভা হয়। স্থানীয় ১ম মুন্সেফ বাবু সারদাপ্রসাদ সেন বি. এম. মহোদয়, মীর মোহছেন আলি সাহেব ও মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব যথাক্রমে প্রাতে, বৈকালে ও রাত্রিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ সাহেব, শেখ জমিরউদ্দীন সাহেব, কবিবর মুনশী মোজাম্মেল হক সাহেব, মুনশীময়জুদ্দীন আহমদ সাহেব, মীর মশাররফ হোসেন সাহেব, মৌলবী সাবের আলী সাহেব, মৌলবী সৈয়দ মর্তুজা হোসেন সাহেব, মৌলবী খবিরুদ্দীন আহমদ সাহেব, কোহিনুর সম্পাদক এস. কে. এম. মোহাম্মদ রওশন আলী সাহেব, কুষ্টিয়া স্কুলের পার্সিয়ান টীচার মৌলবী ফজলুর রহমান সাহেব ও মুনশী মোহাম্মদ এব্রাহিম সাহেব প্রভৃতি বক্তাগণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।[১]

কলকাতায় এবং বাংলার অন্যত্র ভাল বক্তা হিসেবে এঁরা দুজনে বিশেষভাবে পরিচিত হন। ১৩০৫ সালে তাঁদের নোয়াখালি-সফর উপলক্ষে সেখানে বেশ একটা সাড়া পড়ে যায়। এর পরিচয় পাওয়া যায় অজ্ঞাতনামা কবির 'আখলাকে আহমদীয়া' নামক কাব্যে ঃ

... মুনশী মেহেরুল্লা নাম যশোর মোকাম।
জাহান ভরিয়া যাঁর আছে খোশ নাম॥
আবেদ জাহেদ তিনি বড় গুণাধার।
হেদায়েতের হাদী জানো দীনের হাতিয়ার॥
মুল্লুকে মুল্লুকে ফেরে হেদায়েত লাগিয়া।
হিন্দু-খৃষ্টান কত লোক ওয়াজ শুনিয়া॥
মুসলমান হইল সবে কলমা পড়িয়া।
অসার তাদের দীন দিল যে ছাড়িয়া॥
তাঁর সাথে আর এক ছিল নেককার।
মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন গুণের ভাণ্ডার॥
সে দোনো জাহেদ মর্দ্দ ফজলে খোদার।
তের শত পাঁচ সালে ছিল বাঙ্গালার॥
সেই সালের রমজানের ঈদের সময়েতে।
এসেছিল নোয়াখালি সহর বিচেতে॥ ..[২]

১। ইসলাম প্রচারক, ৪ : ২৮১।
২। জমিরুদ্দীন, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৪-৫৫ এ উদ্ধৃত।

তাঁর বক্তৃতা সভার একটি উল্লেখযোগ্য বর্ণনা আসিরুদ্দীনের বইতে আছে :

> সভার প্রথম দিন ২১৩ সহস্র ও দ্বিতীয় দিন ৩১৪ সহস্রেরও উপর লোক সমবেত হইয়াছিল।...... তৎপর স্বনামধন্য বক্তাকুলতিলক মুন্সী ছাহেব মগরেবের নমাজ অন্তে দণ্ডায়মান হইয়া সমাজপতন ও উদ্ধারবৃত্তান্ত, এবাদতের গৌরব, জীবনের কর্তব্যকর্ম, ব্যবসাবাণিজ্য, স্ত্রীশিক্ষা, শিক্ষার উপকারীতা, মোক্তব, মাদ্রাসা, স্কুল স্থাপন, শিল্পশিক্ষা, ধর্মগত প্রাণগঠন, ব্যায়ামচর্চ্চা, সভাসমিতির উপকারিতা, বয়তুল-মাল তহবীল গঠন, বাল্যবিবাহের দোষ, অপব্যয়, সমাজ উন্নতির উপায়, ঘোর স্বজাতি আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত বক্তৃতা করেন।[১]

ধর্মবিষয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান জগত ও জীবনধারা সম্পর্কে যে সচেতনতার পরিচয় এখানে পাওয়া যায়, তা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। পুরাতনের পুনরাবির্ভাব তিনি কেবল কামনা করেন নি, তার নবরূপায়ণ প্রত্যাশা করেছিলেন।

তাঁর তর্কযুদ্ধের ফলে বহু অমুসলমান ইসলাম গ্রহণ করেন এবং বহু ধর্মান্তরিত ব্যক্তি ইসলামে প্রত্যাবর্তন করেন। জমিরুদ্দীন লিখেছেন :

> তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া সহস্র সহস্র লোক শেরেক বেদাত পরিত্যাগ করিয়া দীনদার হইয়াছেন, সহস্র সহস্র বেনামাজী নামাজী হইয়াছেন। কত শত স্থানে তাঁহার বক্তৃতায় মাদ্রাসা, মক্তব ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। কত সুদখোর মহাজন তাঁহার উপদেশে সুদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বক্তৃতায় উৎসাহিত হইয়া বহু লোক ব্যবসায়-বাণিজ্য মন দিয়াছেন। কত সময়ে কত শত হিন্দু ও খৃষ্টান তাঁহার নিকট তৌবা পড়িয়া দীন ইসলাম কবুল করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তিনি যে কত শত সামাজিক কার্য করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না।

এই গৌরবের অংশ জমিরুদ্দীনেরও প্রাপ্য।

৬

১৯০৭ সালের ৭ই জুন (২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩১৪) মুনশী মেহেরুল্লাহ্‌র কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে। এরপর জমিরুদ্দীন কতদিন জীবিত ছিলেন, তা সঠিকভাবে বলা দুষ্কর, তবে ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বইতেও তাঁর রচিত ভূমিকা দেখা যায়। জমিরুদ্দীনের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে আর দু' তিনটি ঘটনা মাত্র

১। আসিরউদ্দীন, মেহেরুল্লা-জীবনী, পৃ ২৫-২৭।

আমাদের জানা আছে। ১৩০৮ সালের ৮ই কার্তিক তাঁর সহধর্মিনী শামসুন্নেসার মৃত্যু হয়। পরবর্তী বৎসরে "কলিকাতা সিন্দুরিয়া পটীর সুবিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা" হাজী মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্‌র কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। ১৩১০এর ২২শে আষাঢ় হাজী সাহেব পরলোকগমন করেন, এ খবরটি তখনকার 'ইসলাম প্রচারকে' মুদ্রিত হয়।

তিন

মেহেরুল্লাহ্‌র প্রথম বই 'খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা' (১২৯৩ ১৮৮৬)[১] ষোল পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। সূচনায় তিনি খৃষ্টধর্মপ্রচারকদের নিন্দা করেছেন— অপরাপর ধর্মমতের প্রতি তাঁরা নিয়তই অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে থাকেন বলে। কিন্তু ধর্মসংশ্লিষ্ট বিতর্কে প্রবেশ করে অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা টিকিয়ে রাখা যে কত কঠিন, তার প্রমাণ তিনি নিজেও দিয়েছেন। যীশুখৃষ্টের পূর্বপুরুষদের মধ্যে অন্ততঃ দুজন (পেরষ ও বোয়স) যে জারজ সন্তান ছিলেন এবং অনেকে যে পরনারীগমন করতেন, পানাসক্ত ও প্রবঞ্চক ছিলেন, বাইবেল থেকে এই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করে মেহেরুল্লাহ্‌ বলতে চেয়েছেন যে, ইন্দ্রিয়-পরায়ণতার এই ধারাই পরবর্তীকালের খৃষ্টানদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। যীশুখৃষ্টের মধ্যে সাধারণ নীতিজ্ঞানের অভাব লক্ষ্য করে তিনি বলেছেন:

> যীশুর আগমনে জগতের শান্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং কত শত নিষ্পাপ শিশুর প্রাণহত্যা ও কত শত স্ত্রী পুরুষের অবিশ্রান্ত অশ্রুবারি বিসর্জ্জন করাই সার হইয়াছিল। যদি ইনিই খ্রীষ্টানদিগের শান্তিকর্ত্তা হন, তবে এমন শান্তিকর্ত্তাকে আমাদের নমস্কার! [১৩]

শুধু যীশুকেই নয়, বাইবেলের স্রষ্টাও তাঁর শ্রদ্ধা অর্জন করতে সক্ষম হন নি:

> আহা! বাইবেলের ঈশ্বর কত বড় নির্দ্দয়! "দেখ, আমালেকীয় নামে এক জাতি পাপী হওয়াতে, ঈশ্বর সেই জাতির সর্ব্বস্ব বর্জ্জিতরূপে বিনষ্ট করিতে ও তাহাদের স্ত্রী ও পুরুষ ও স্তন্যপায়ী শিশু এবং গরু, মেষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ সকলকে বধ করিতে শৌল রাজাকে আজ্ঞা দিলেন।" ১ম শিমুয়েল পুঃ ১৫। ... বাইবেলের ঈশ্বর মিথ্যাবাদী ও মিথ্যা শিক্ষাদাতা; দেখ ১ম রাজাবলী ২২—২০...। [১৬]

১। মোহাম্মদ মেহেরউল্লা, খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা (তৃ-স; কলিকাতা: রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৮)।

ত্রিত্ববাদের অসত্যতা ও বাইবেলে পরস্পরবিরোধী উক্তি প্রদর্শনের চেষ্টাও তিনি এখানে করেছেন।

'মেহেরুল ইসলাম'[১] সম্ভবতঃ তাঁর দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ। এটি গদ্য-পদ্য রচনা; মূল রচনা অধিকাংশই ছন্দোবদ্ধ, কিছু অংশ এবং পাদটীকা গদ্যে লেখা। এতে, প্রথমে তিনি একেশ্বরবাদের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন এবং হিন্দু ও খৃষ্টানদেরকে মূল ধর্মবিশ্বাস থেকে বিচ্যুত বলে গণ্য করেছেন:

যদিও নাছারা হিন্দু আদি ছারা
মুখে এক খোদা কয়।
কাজে ও পূজায় ছাফ দেখা যায়
একজন কভু নয়॥...
খ্রীষ্টীয়ান দলে মূল খোদা ভুলে
হজরত ইছার তরে।
কভু পরোয়ার কভু বেটা তাঁর
জানিয়া বন্দেগী করে॥

প্রসঙ্গক্রমে ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে তিনি খুব তাৎপর্যপূর্ণ একটি মন্তব্য করেছেন:

> হিন্দুদিগের মধ্য হইতে স্বনামখ্যাত রাজা রামমোহন রায় আরবী, পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া পবিত্র ইসলাম ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা পূর্ব্বক একেশ্বরবাদ ধর্ম্ম প্রচার করেন। তাঁহার মতাবলম্বী ব্রাহ্ম সম্প্রদায় মুসলমান জাতির অনেকটা কাছাকাছি।

বইয়ের পরবর্তী অংশে তিনি মোমিন মুসলমানের পক্ষে আবশ্যকীয় ধর্মানুষ্ঠান পালনের (নামাজ, রোজা ইত্যাদি) প্রয়োজনীয়তা ও যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেছেন। স্রষ্টা ও মানুষের সম্পর্ক বোঝাতে প্রায়ই তিনি ব্যবহারিক জীবন থেকে উপমা গ্রহণ করেছেন; যেমন, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও জমিদার-রায়তের সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ্‌র প্রতি মানুষের কর্তব্যের ব্যাখ্যা তিনি দিয়েছেন। যাঁরা এইসব আচার-অনুষ্ঠান পালন করেন না, তাঁদের প্রতি তীব্র ক্ষোভও এতে প্রকাশিত হয়েছে। এই দলের মধ্যে তাঁর প্রধান আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছেন বাউল ("নাড়ার ফকির") ও কবি-গায়কেরা ("গাইন"):

১। অধ্যাপক মুহম্মদ মোহর আলীর সৌজন্যে এই দুষ্প্রাপ্য বইটির একটি খণ্ডিত কপি (পৃ ১৭-৬৮) দেখেছি। আভ্যন্তরীণ প্রমাণে মনে হয়, এটি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তীকালের রচনা।

যে সকল আহম্মক নামাজে নারাজ।
বলে, পাচ ওয়াক্ত কেনে পড়িব নামাজ।
হামেশা ইয়াদ মোরা করি পরোয়ারে।
ডাকিলে কি হবে তায় শুধু পাচ বারে॥
নাড়ার ফকির যারা আছে গায় গায়।
এই ঘোরে বহুজনে ফেলিল দাগায়॥

তাঁর শ্লেষোক্তি থেকে ধনীরাও রক্ষা পান নি:

...এদেশের অধিকাংশ ধনী মোছলমানদের বিশ্বাস যে, নামাজ রোজা ইত্যাদি কাজ কেবল মিছকিনদিগের জন্য ভদ্র হইতে গেলে দহলিজে ঢোলক তবলা রাখাই আবশ্যক।

এদেশে অনেক সুদখোর মোসলমান আছেন, যাহারা সুদকে হারাম জানিয়াও লোভবশতঃ তাহা ছাড়িতে পারিতেছেন না, আবার জানিয়া হারাম খাই বলিয়া নামাজ পড়িয়াই বা কি করিব, এই জ্ঞানে অনেকেই আজ কাল করিতে করিতে মরণ পর্য্যন্তও তওবা করিয়া দিন কবুল করিয়া মরিতে পারিল না।

গাইনদের সম্পর্কে তিনি বলেন:

এখনও অনেক গাইনের স্পষ্ট কাফেরী কালাম পাওয়া যায়, তাহাদের জানাজা নমাজ পড়া ঠিক নহে।... হে গাইনগণ, তোমরা নিজেও ডুবিলে, পরকেও ডুবাইলে।[২৭]

২৭। এই মন্তব্যটি তিনি করেছেন পাগলা কানাইয়ের প্রসঙ্গে। তিনি আরো বলেছেন: "যশোহর—ঝিনাইদহার অন্তর্গত বেড়বাড়ী সাকিনে 'পাগলা কানাই' নামে যে বিখ্যাত জারি গাইন ছিল, অশিক্ষিত লোকের মধ্যে তাহার ন্যায় নামোয়ার গাইন আর কখনো বঙ্গে দেখা যায় নাই। এই গাইনের প্রতি জোড়া ধুয়া গানের মূল্য অনেক টাকা হইত, ইহার আখড়ায় ১০।১৫ হাজার লোক জমা হইত। ...কানাই গাইনের অনেক গানে স্পষ্ট শেরেকী আছে, সে রাম ও রহিমকে প্রায় তুল্য জানিত।" পরে অবশ্য মেহেরুল্লাহ্‌, জানতে পারেন যে, ইসলাম ধর্মে কানাইয়ের অটুট বিশ্বাস ছিল এবং তিনি তাঁর কবর জিয়ারত করেন — এ তথ্য একই বইতে শেখ জমিরুদ্দীন-রচিত একটি টীকায় উক্ত হয়েছে। কানাই সম্পর্কে জমিরুদ্দীন একটি নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রকাশ করেছেন: "এই বেড়বাড়ী কানাই বয়াতির (পাগলা কানাইয়ের) জন্মস্থান। ১২৯৬ সালের ২৮শে আষাঢ় প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে তাহার মৃত্যু হইয়াছে।" ডক্টর মযহারুল ইসলাম পাগলা কানাইয়ের যে মৃত্যু-তারিখ অনুমান করেছেন, (১৮৯০-৯৫) সেটি এর থেকে (১৮৮৯) খুব দূরে নয়; তবে তাঁর অনুমিত কানাইয়ের জন্ম-তারিখ (১৭৮০) স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত। দ্রষ্টব্য মযহারুল ইসলাম, কবি পাগলা কানাই (রাজশাহী: বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯)। জমিরুদ্দীনের সাক্ষ্য-অনুযায়ী কানাইয়ের জন্ম ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে।

এই উক্তিসমূহ থেকে মেহেরুল্লাহ্‌র চিন্তাধারাটা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ-গোচর হয়ে উঠে। তিনি ইসলামকে কেবল খৃষ্টধর্মাবলম্বীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চান নি, প্রচলিত ধর্মজীবনের সংস্কারও তাঁর কাম্য ছিল। সৈয়দ আহমদ বেরিলিভীর সংস্কারান্দোলনের দ্বারা তিনি প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন, এমন ধারণা করাও যুক্তিসঙ্গত। সৈয়দ আহমদ-পন্থীরা মুসলমানদের প্রচলিত জীবনধারা থেকে অনেক কুসংস্কার দূর করতে যেমন শিক্ষা দিয়েছিলেন, তেমনি তাঁদের রক্ষণশীলতা আধুনিক জীবনযাত্রার সঙ্গে কোন আপোষ করতে দেয় নি। অনুরূপভাবে, মেহেরুল্লাহ্‌ও যেমন আমাদের জীবনে ধর্মবোধের যথার্থ প্রতিষ্ঠা দেখতে চেয়েছিলেন, তেমনি ধর্মনিরপেক্ষ চিন্তাধারা এবং সঙ্গীত প্রভৃতি সুকুমার অনুভূতির বিকাশকে প্রশ্রয় দেন নি। ধর্মজীবন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা এর অনুকূলে ছিল না। তাছাড়া, একথাও মনে রাখতে হবে যে, উনিশ শতকে নৃত্য-গীতের বিশুদ্ধ চর্চা আমাদের দেশের অভিজাত মহলে যতটা প্রচলিত ছিল, তার চাইতে এই সবের আনুষঙ্গিক উচ্ছৃঙ্খলতার চর্চাই প্রাধান্য লাভ করেছিল।[১] তবে সৈয়দ আহ্‌মদ-পন্থীদের সঙ্গে মেহেরুল্লাহ্‌র যে কালগত ব্যবধান, তার ফলে আধুনিক জীবন ও জগত সম্পর্কে তাঁদের মতো নির্লিপ্ত তিনি হতে পারেন নি। তাই ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের কথাও তিনি ভেবেছেন এবং ইসলামের পুনর্জাগরণের চিন্তার পাশাপাশি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তার মূলগত ঐক্যের কথাও বলেছেন।

'বিধবাগঞ্জনা'র প্রথম প্রকাশকাল আমার জানা নেই।[২] এটি মূলতঃ হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের সুপারিশ করে লেখা। মুসলমান সমাজেও এর

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (নতুন-স ; কলিকাতা : নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫২) দ্রষ্টব্য।

২। আমার দেখা বইটির আখ্যাপত্র ছিল না। প্রথম পৃষ্ঠার শিরোভাগে "বিধবাগঞ্জনা /ও/ বিষাদ ভাণ্ডার" আখ্যার পর সীলমোহর আছে: Bengal library,/ Writers Buildings/ 31 MAR 98. এ থেকে অনুমান করা যায় যে, ১৮৯৭র শেষভাগে (বা ১৮৯৮র প্রথমে) এটি প্রকাশিত হয়। কিন্তু এটি বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণ। ৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকায় আছে: 'তিনি [কোন হিন্দু বিধবা] বিধবাগঞ্জনা প্রথমবার পাঠ করিয়া পত্র লেখেন—"। ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীর পুস্তক তালিকায় ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত বিধবাগঞ্জনার ষষ্ঠ সংস্করণের উল্লেখ আছে।

অপ্রচলনের নিন্দা তিনি করেছেন এবং এ বিষয়ে সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর সঙ্গে তাঁর মতৈক্য লক্ষণীয়। এটিও গদ্য-পদ্য রচনা। প্রথম ও শেষ ভাগ ছন্দোবদ্ধ; মধ্যে গদ্যের ব্যবহার আছে। প্রথমাংশে সধবা সরলা ও বিধবা তরঙ্গিনীর কথোপকথন। নানাচ্ছন্দে বিলাপ করতে করতে তরঙ্গিনী বলছেন :

পর পতি হেরে
প্রাণ যাহা করে
প্রকাশিয়া নরে বলা নাহি যায়
কলেমা গ্রহণ
করিলে তখন
দুঃখ বিমোচন হইবে নিশ্চয়।

ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজ সরকারের উপরেও বিধবাদের আশা-ভরসার উল্লেখ আছে :

হা ইংরেজ শ্বেতকায় মহাবীর দল।
ধরে সব বীর বেশ উদ্ধারিলে কত দেশ
(হায়!) বিধবা-উদ্ধার তরে হলে দুরবল?

বলা বাহুল্য যে, এই আক্ষেপোক্তি-রচনার পূর্বেই হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহের আইন সরকারীভাবে গৃহীত হয়েছিল। কাজেই, ইংরেজ শাসনের প্রতি এই আস্থা প্রকাশে বা মহারাণীর প্রতি বিধবাদের আবেদনে অথবা লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রশস্তিতে তাঁর যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা হচ্ছে সরকারের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টার প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। এই মনোভাব তাঁর প্রাগ্রসর চিন্তাধারার পরিচায়ক। আমরা জানি যে, সিপাহী অভ্যুত্থানের কালে সরকারের এসব প্রগতিশীল সংস্কারকর্মকে কিছুটা ভুল ব্যাখ্যা করে জনসাধারণের রক্ষণশীল চিত্তকে ইংরেজের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলার চেষ্টা হয়েছিল এবং সে প্রচেষ্টা বিফল হয় নি। 'বিধবাগঞ্জনা'য় কিন্তু এইসব পদক্ষেপকে ধর্মীয় জীবনের উপরে খৃষ্টান সরকারের হস্তক্ষেপরূপে দেখা হয় নি, বরঞ্চ অভিনন্দিত করা হয়েছে। রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিও শ্রদ্ধানিবেদন এতে আছে। এ থেকে আমরা বুঝি যে, মেহেরুল্লাহ্‌র ধর্মবোধ এমন একটা যাথার্থ্য ও উদারতার

মধ্যে মুক্তি পেয়েছিল, যার ফলে কেবল স্বধর্মের ক্ষেত্রে নয়, অন্য ধর্মাবলম্বীর জীবনযাত্রাও সংস্কারমুক্ত হোক এবং মানবিক মূল্যবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হোক, এই আত্যন্তিক অভিপ্রায় তিনি ব্যক্ত করেছিলেন।

'বিধবাগঞ্জনা'র গদ্যাংশে মধ্যে মধ্যে কথার খেলা আছে:

> আমার বাবা ও খুড়োরা এত যে বুড়ো, তবু তাদের বাজে কথার হুড়োহুড়ী দেখলে জ্ঞান বুদ্ধিটা গুঁড়ো হয়ে যায়।

তবে বইটিতে মেহেরুল্লাহ্ সুরুচির পরিচয় দেন নি। বিধবাদের (এবং বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্যাদের) দুরবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে— ভারতচন্দ্রীয় 'নারীগণের পতিনিন্দা'র স্টাইলে — তিনি যতখানি বাস্তবধর্মী হতে চেয়েছেন, সাহিত্যকর্মের পক্ষে অতটা অনুমোদনযোগ্য নয়। এই কারণেই তাঁর 'বিধবাগঞ্জনা' এবং 'হিন্দুধর্ম্মরহস্য ও দেবলীলা' বই দুটির প্রচার সরকার বন্ধ করে দেন। তাঁর এই রুচিদোষের কারণ বোধহয় তাই, যাকে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের গর্হিত রুচির অন্যতম হেতু বলে নির্ণয় করেছিলেন —অর্থাৎ "পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা"।

'পান্দ্‌নামা' (দ্বি-স ১৯০৮) শেখ সাদীর সুবিখ্যাত কাব্যের অনুবাদ। এতে ফারসী ও বাংলা অক্ষরে মূল কাব্যের সঙ্গে তার পদ্যানুবাদ আছে।

মেহেরুল্লাহ্ আরও দুটি বই লিখেছিলেন: 'রদ্দে খৃষ্টান ও দলিলোল এসলাম' দু খণ্ডে সম্পূর্ণ; দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ 'দলিলোল এসলাম' প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। তার আগেই বের হয়েছিল 'খৃষ্টান মুসলমান তর্কযুদ্ধ'। পূর্বোক্ত বইটির মত এটিও খৃষ্টান ধর্মপ্রচারকদের প্রচারণার জবাবে লেখা।

চার

জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ অনেকগুলো বই লিখেছিলেন। প্রচলিত মতে, তাঁর গ্রন্থসংখ্যা শতাধিক: তবে কেউ এ পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থপঞ্জী তৈরীর ভার গ্রহণ করেন নি বলে এই সংখ্যাটিকে কিংবদন্তী রূপেই গণ্য করতে হয়। আমি তাঁর যেসব বইপত্র দেখেছি, তার একটা কালানুক্রমিক বিবরণ এখানে দেবার চেষ্টা করবো।

'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বিদিগের মন্তব্য' (১৯০০) [১] ষাট পৃষ্ঠার বই। ইসলাম সম্পর্কে "সঞ্জীবনীর সুযোগ্য সম্পাদক, সুবিদ্বান

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্ম্মাবলম্বিদিগের মন্তব্য (তৃ-স; নদীয়া: নূরজাহান খাতুন, ১৩১৭)। পঞ্চম-স ১৯২৬।

ও সুবিজ্ঞ বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, বি, এ, মহাশয়ের", "কোরাণ ও হাদিসের বঙ্গানুবাদক ও ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের", "সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত টমাস কার্লাইলের", "সুবিখ্যাত পণ্ডিত গোপালচন্দ্র শাস্ত্রী এম, এ, ডি, এস্, সি, মহাশয়ের", "সুবিখ্যাত পরিব্রাজক চন্দ্রশেখর সেন, ব্যারিষ্টার য়্যাট-ল মহাশয়ের," আচার্য কেশবচন্দ্রের, পণ্ডিত ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীর (এটি 'মিহির ও সুধাকর', ৫ শ্রাবণ ১৩০৯, থেকে গৃহীত হয়), "ইউনিটি ও মিনিষ্টার সম্পাদক, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচারক রেভাঃ মহেন্দ্রনাথ বসুর", "সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক পত্রিকা হিতবাদী"র এবং পণ্ডিত ম্যাক্সমূলারের মন্তব্য এতে সংকলিত হয়েছে। মেহেরুল্লাহ ও আরো কয়েকজনের অনুরোধে এই সংকলন কার্যে তিনি উদ্যোগী হন।

'আসল বাঙ্গালা গজল' (পরিবর্ধিত নবম-স ; ১৯১৩)[১] -ও একটি সংকলন। ভূমিকায় জমিরুদ্দীন বলেছেন যে, মীর মশাররফ হোসেনের 'বাঙ্গালা মৌলুদ শরীফ' পাঠ করে তাঁর ও মেহেরুল্লাহ্‌র গজল লেখার আগ্রহ জন্মে। বিভিন্ন সভায় পঠিত এইসব গজল জনপ্রিয় হওয়ায় তিনি এই সংকলন প্রকাশ করেছেন। এতে যে একুশটি গজল সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে বারোটি তাঁর রচনা এবং দুটি মেহেরুল্লাহ্‌র ; মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক (ভোলা), দেওয়ান শামসুদ্দীন,[২] সলিমউদ্দীন বিদ্যাবিনোদ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া আঞ্জুমান ইসলামিয়ার একটি করে গজল এতে গৃহীত হয়েছে। হিন্দু লেখকদের মধ্যে স্থান পেয়েছেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ("জীবনসঙ্গীত") এবং কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, আসল বাঙ্গালা গজল (নবম-স ; কলিকাতা : রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩২০)। প্রথম প্রকাশ ১৩১২। নবম সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায় যে, "তিন চারি বৎসরের মধ্যে প্রায় পঞ্চবিংশ সহস্র পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে।"

২। এঁর রচনার অংশ :

আমরা কি ওহে সেই মোসলমান,
করিতেন যাঁহাদের কন্যা সম্প্রদান,
কত হিন্দু রাজগণ
হয়ে হরষিত মন
ছুঁইও না বলি আজি করে হেয় জ্ঞান,
আমরা কি ওহে সেই মোসলমান।

ত্রিপুরা জেলার পাদ্‌রী জন টেকেল-বিরচিত 'শ্রেষ্ঠ নবী কে? ও মুনশীর ভুল' পুস্তিকার প্রতিবাদে জমিরুদ্দীন 'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন'[১] (১৯১৬) প্রকাশ করেন। ফুরফুরার পীর আবুবকর সাহেবের আদেশে হজরত মুহম্মদের (দঃ) এই জীবনীটি তিনি রচনা করেন। 'মোজেজা'য় তিনি আস্থাজ্ঞাপন করেছেন, হজরতের অঙ্গুলিসংকেতে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়েছে, এই প্রচলিত মতকে তিনি গ্রহণ করেছেন। কোরআনের সত্যতা ও বাইবেলের অসত্যতা প্রমাণ করতেও তিনি চেষ্টিত হন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন ঃ

> পাদ্রী [ওয়েঙ্গার] সাহেব সার সৈয়দ আহমদ, ইমাম ফখরুদ্দীন কিম্বা বুখারী শরীফ হইতে প্রমাণ করিতে চান যে, বাইবেল পরিবর্তন হয় নাই; কিন্তু পাদ্রী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করি যে তাঁহারা কি এই সমস্ত প্রামাণ্য গ্রন্থ দেখিয়াছিলেন না পড়িয়াছিলেন?

ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে স্যার সৈয়দ আহমদের সঙ্গে তাঁর মতৈক্য ছিল না বলেই মনে হয়।

খৃষ্টান পাদরীদের প্রচারণার জবাবে তিনি অনেকগুলো প্রচার-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, যেগুলোর সাধারণ নাম "রদ্দে খৃষ্টান"। এগুলোর অধিকাংশই ফুরফুরার পীর সাহেবের আদেশে লিখিত হয়। রদ্দে খৃষ্টান সিরিজের প্রথম নম্বর 'ইসলামী বক্তৃতা' (১৯০৭)[২] উৎসর্গ করা হয়েছিল নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে। বইটি 'ক্রিশ্চিয়ানিটী এ্যাণ্ড ইসলাম' নামক ইংরেজী গ্রন্থের ভাবানুবাদ। পাঁচটি পরিচ্ছেদে ইসলাম সম্বন্ধে ক্যানন আইজাক টেলর, লিটনার, টমাস ও কার্লাইলের এবং ফারাক্লিত সম্বন্ধে ভূতপূর্ব পাদ্রী জন আবদুল্লাহ্‌র বক্তৃতার মর্ম এতে সংকলিত হয়েছে।

এই পর্যায়ের দ্বিতীয় বই 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য' (১৯২৫)।[৩] এটি ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত রাউস-রচিত হজরত মুহম্মদের আবির্ভাব বিষয়ক বাইবেলের ভবিষ্যদ্বানী সম্পর্কিত প্রবন্ধের তরজমা বারো পৃষ্ঠার পুস্তিকা।

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি, শ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন (কলিকাতা : রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩২৩)।

২। শেখ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ কাব্যনিধি, ইসলামী বক্তৃতা (চ-স; নদীয়া : শেখ আজিমুদ্দীন, ১৩৩২)। দ্বি-স ১৩১৭; তৃ-স ১৩২২।

৩। শেখ মোঃ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ-কাব্যনিধি, ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য (নদীয়া : গ্রন্থকার, ১৩৩২)।

তৃতীয় পুস্তিকা 'রদ্দে সত্যধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃষ্টান' (১৯২৫)।[১] নদীয়ার ক্যাথলিক মিশনের পাদ্রীরা 'সত্যধর্ম্ম নিরূপণ' বলে একটি পুস্তিকা প্রচার করেছিলেন। এতে হজরত মুহম্মদকে (দঃ) মিথ্যাবাদী, ধূর্ত, প্রবঞ্চক, দস্যু, বিশ্বাসঘাতক, দুষ্কৃতিকারী, লম্পট ও বৈরিনির্যাতক বলে চিত্রিত করে তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে মিথ্যা বলে অভিহিত করা হয়। তাঁর ভাষায়, "কোরাণের ধর্ম্ম মনুষ্যের যোগ্য নহে কিন্তু শূকরের ধর্ম্ম"। এর প্রতিবাদেই জমিরুদ্দীন উক্ত গ্রন্থ রচনা করেন। বইটি মুদ্রণের জন্য অর্থসাহায্যের আবেদন জানিয়ে ফুরফুরার পীর সাহেব বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। মুসলমানদের পরিচালিত সাময়িকপত্রেও এ সম্পর্কে আবেদন প্রকাশিত হয়। এইসব আবেদন নিবেদনে বাংলা সরকারেরও টনক নড়ে এবং তাঁরা নিম্নোক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেন ঃ

> The attention of the Government has been drawn to an article which appeared in the "Mussalman"[২] of February 17, 1925 entitled "Malicious attack on the Holy prophet."... On securing a copy of the book, the Government have learnt that it was published in 1899. The Govt. has also been informed that it has been out of print for 15 years. ..

জমিরুদ্দীনের বইতে 'সত্যধর্ম্ম নিরূপণ' থেকে "মোহাম্মদী ধর্ম্মের পরীক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধটি (উপরে যার কথা বলা হয়েছে) পুনর্মুদ্রিত হয় এবং টীকা সংযোজন করে তার উত্তর দেওয়া হয়।

চতুর্থ পুস্তিকা 'হজরত ইসা কে ?' (সহ-শিরোনামা ঃ 'অর্থাৎ তিনি বান্দা কি খোদা, এতদ্বিষয়ক সমালোচনা ও শাস্ত্রীয় মীমাংসা') প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে[৩]। আকবর মসীহ্-রচিত উর্দু গ্রন্থ 'উলুহতে মসীহ' অবলম্বনে মুন্শী

১। মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, রদ্দে সত্যধর্ম্ম নিরূপণ ও হেদায়েতুল খৃষ্টান (নদীয়া ঃ গ্রন্থকার, ১৩৩২)।

২। প্রথম প্রকাশ কলিকাতায় সাপ্তাহিক পত্ররূপে ঃ ডিসেম্বর ১৯০৬। সম্পাদক ঃ আবুল কাসেম, পরে মুজিবর রহমান। ১৯২৫ এর জানুয়ারী থেকে সপ্তাহে তিনবার প্রকাশ পেত। ১৯৩২ এর ৮ই জুলাই থেকে দৈনিক পত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৩। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, হজরত ইসা কে ? (চ-স ; কলিকাতা ঃ শেখ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, ১৩৩৩)। পুস্তিকাকারে প্রকাশের পূর্বে 'ইসলাম-প্রচারকে' মুদ্রিত (আগস্ট ১৮৯৯ ঃ "প্রভু যীশুখ্রীষ্ট কে ?")। দ্বি-স ১৩১৪।

মেহেরুল্লাহ্‌র অনুরোধে এটি লেখা হয়ঃ মেহেরুল্লাহ্ বইটির আদ্যোপান্ত সংস্কারসাধনও করেন। এর থেকে একটু উদ্ধৃত করি ঃ

> ইসাই বা খ্রীষ্টানদিগের পূর্ণ বিশ্বাস এই যে হজরত ইসা বা যীশুই পূর্ণ ঈশ্বর; স্বয়ং জগৎপিতা স্বর্গীয় ঈশ্বর...। [৭] ইঞ্জিলে জ্বলন্ত ভাষায় লেখা আছে যে, 'আদম ঈশ্বরের পুত্র" দেখ, লুক ৩ অঃ ৩৮ পদ। এখন কি আমরা বলিব যে, আদমের পুত্রগণ সকলেই ঈশ্বর ছিলেন এবং তাহারা সকলেই ঈশ্বরকে ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিত কি? সত্য যদি প্রেরিতগণ যীশুকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা সেই আদমের ন্যায়; কিন্তু তাহাতে তিনি কদাচ খোদা হইতে পারেন না। ... [২১-২২]

সাত নম্বর পুস্তিকা 'পাদ্রি মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন' (নদীয়া, ১৯২৭)।[১] হজরত মুহম্মদকে (দঃ) আক্রমণ করে মনরো 'হজরত মোহাম্মদএর বেগোনা থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলবীগণের শিক্ষা' নামে যে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, জমিরুদ্দীন তার উত্তর দেন এই পর্যায়ে। পুস্তিকায় সন্নিবিষ্ট অনুরোধ-পত্রে ফুরফুরার পীর আবুবকর লেখেন ঃ

> সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, খৃষ্টান পাদরীরা ইস্‌লামকে ধ্বংস করিবার জন্য সাত কোটী কেতাব লিখিয়াছে। সম্প্রতি হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর কুৎসা করিয়া ও তাঁহাকে অকথ্য ভাষায় গালি দিয়া ৫২ খানা কেতাব লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছে। এই সকল কেতাবের প্রতিবাদ না লিখিলে ইস্‌লামের বিশেষ ক্ষতি হইবে। ইস্‌লাম-প্রচারক মৌলবী মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ সাহেব ব্যতীত বর্তমানে আমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নাই যে, পাদ্রির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন। আমি উক্ত মৌলবী সাহেবকে ঐ ৫২ খানা কেতাবের প্রতিবাদ লিখিতে আদেশ করিয়াছি। আর তাঁহার কৃত "রদ্দে খৃষ্টান" সংক্রান্ত সমস্ত কেতাব "মজমুয়ে রদ্দে নাছারা" নাম দিয়া প্রকাশ করিতে বলিয়াছি, কেতাবও ছাপা হইতেছে। এই আবশ্যকীয় কার্য্যে বিস্তর টাকার আবশ্যক। আমার মুরিদান ও অন্যান্য দীনদার মুসলমানদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতে অনুরোধ করিতেছি।

পূর্বোক্ত পুস্তিকায় মনরোর বক্তব্য ছিল এই যে, কোরআনে দেখা যায় যে, হজরত মুহম্মদ এবং (যীশু ভিন্ন) অন্যান্য নবী স্বীয় পাপ স্বীকার করেছেন এবং স্রষ্টার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। অতএব, তিনি নিষ্পাপ ছিলেন না। বাইবেলের উদ্ধৃতির সাহায্যে জমিরুদ্দীন দেখালেন যে, সেখানেও যীশুর

১। পাদরী মওলানা শাহ সুফী শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ শাস্ত্রী, পাদ্রি মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন (নদীয়া : শাহ মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন, ১৩৩৪)।

অপরাধ স্বীকৃতি ও ক্ষমাভিক্ষা আছে। হজরত মুহম্মদকে নিষ্পাপ প্রমাণ করার জন্যে তিনি আর একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন ; তার নাম, 'মাসুম হজরত মোহাম্মদ'।

মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে জমিরুদ্দীন 'মেহের-চরিত' প্রকাশ করেন। মোট ১৫৮ পৃষ্ঠার এই বইটিতে মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনকাহিনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের উভয়ের মিলিত প্রচার আন্দোলনের বিবরণ আছে। রচনারীতির বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ না পেলেও বস্তুনিষ্ঠ তথ্য পরিবেশনের দিক দিয়ে এটি মূল্যবান। বইটির শেষে মেহেরুল্লাহ্‌র মৃত্যুতে মুসলমান-পরিচালিত সংবাদপত্রসমূহের মন্তব্য এবং জমিরুদ্দীন, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ফজলল করিম ও শেখ হবিবর রহমান প্রভৃতি লেখকের কবিতা সংকলিত হয়েছে।

'মেহের-চরিতে' জমিরুদ্দীনের লেখা 'আমার জীবনী ও ইস্‌লাম গ্রহণ' বইটির উল্লেখ আছে ঃ ১৩০৪ সালে মেহেরুল্লাহ্ এটি প্রকাশ করেন। তাঁর আর কয়েকটি বইয়ের নামও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ 'জওয়াবোন্নাছারা', 'খোশগল্প', 'উপদেশ ভাণ্ডার', 'দুইশত উপদেশ' প্রভৃতি। 'ইস্‌লাম-প্রচারকে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "বাইবেলে বহুবিবাহ" (সেপ্টেম্বর ১৮৯৯) এবং "জীবহত্যা" (নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯) উল্লেখযোগ্য।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে জমিরুদ্দীনের 'শোকানল' [১] প্রকাশিত হয়। তাঁর কয়েকজন পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে তিনি পাঁচটি কবিতা লেখেন, এখানে তা সংকলিত হয়েছে। প্রথমা পত্নীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন ঃ

অকালে কোথায় গিয়া করিতেছ বাস,
কহ ত্বরা, ত্বরা করি যাই তব পাশ।...
মনে যত উপজয়
হৃদয় বিদীর্ণ হয়
নবম বর্ষীয়া তুমি বালিকা যখন ;
তব সনে হয় মম বিবাহ-বন্ধন ;
সেই প্রেম-সম্মিলনে,
এক সঙ্গে দুই জনে

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, শোকানল (কলিকাতা ঃ রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, ১৩১৬)।

সুখ-দুঃখে এ সংসারে কাটালেম কাল,
ভাবি নাই ভাগ্যে মোর ঘটিবে এ কাল।...
রাখি নাই কত কথা কতই তোমার,
স্ত্রৈণ বলি পাছে হই ঘৃণিত সবার।

দ্বিতীয়া পত্নীর পিতার উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

কেমনে ভুলিব পিতঃ! ভুলিতে না পারি,
তব মুখখানি আমি অনুক্ষণ স্মরি।
পক্ক-দাড়ী সুবদন,
সু সুন্দর ও গঠন
হেরিতে বাসনা সদা বলিব কি হায়,
এই ছিলে অকস্মাৎ লুকালে কোথায়?

'শোকানলে'র কবিতাগুলি সরলভাষায় লিখিত এবং আন্তরিক অনুভূতিতে পূর্ণ। তবে কবিত্ব এতে খুব কমই আছে, তা বোধহয় স্পষ্ট করে না বললেও চলে।

তাঁর আরেকটি বই 'বিশুদ্ধ খতনামা' (১৯০৩)[১] আদর্শ পত্ররচনা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত। পত্রলেখকদের প্রতি উপদেশে তিনি বলেছেন, "মুসলমানের নামের পূর্বে শ্রী লিখিতে নাই, উহা ইসলাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ"। বইটি থেকে কয়েকটি আদর্শ পাঠ তুলে দিচ্ছি।

পিতাকে লিখিত পত্রের শিরোনামা ঃ

বখেদমতে কেবলায়ে মোয়াজ্জম কাবায়ে মোকাররম,
জোনাব মুনশী আনারুদ্দীন আহমদ সাহেব
পাক জোনাবেষু।

ছোট বোন ও শ্যালিকাকে লিখিত পত্রের শিরোনামা ঃ

হামশিরা আকিফা মস্তুরা
বিবি করিমন নেসা সাহেবা
দোওয়াবরেষু।

১। শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন, বিশুদ্ধ খতনামা (পঞ্চম-স; কলিকাতা ঃ মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড ব্রাদার্স, ১৩১৮)।

স্ত্রীকে ঃ

বেয়াপ্তনিহিতালা সানহু বানাজাদে বান্নুয়ে
দামসাদ হামদাম ও হামরাজ ইয়ানে
নছিরুন্নেসা সাল্লাম আল্লাহতালা
বিবি নছিরুন্নেসা খাতুনে জান্নাত।

এর পরে সন্নিবিষ্ট স্ত্রীর প্রতি স্বামীর পত্রটিও এগুলোর শিরোনামার মতোই কৌতুকাবহ।

জমিরুদ্দীনের গ্রন্থাদির যা কিছু মূল্য তা বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে। মেহেরুল্লাহ্‌র বই সম্পর্কেও আমরা এই মন্তব্য করতে পারি। আমাদের সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। রচনার যে প্রসাদগুণে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাসের আলোচনা সাহিত্য হয়ে ওঠে, তা তাঁদের লেখনীতে প্রকাশ পায় নি। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই। এঁরা কেউই সাহিত্য-যশোলিপ্সু ছিলেন না। খৃষ্টান ধর্মপ্রচারের প্লাবনে এবং আভ্যন্তরীণ দুর্বলতায় বাঙালী মুসলমানের ধর্মজীবনে যে ভাঙ্গন এসেছিল, এঁরা তা রোধ করতে চেয়েছিলেন। সে প্রচেষ্টায় সাফল্য লাভ করে গৌরবের জয়টীকা এঁরা ললাটে ধারণ করেছিলেন, সেটাই আনন্দের কথা।

পরিশিষ্ট

ক : দ্বিতীয় মেহেরুল্লাহ্

সেযুগে মোহাম্মদ মেহেরউল্লা নামে আরো একজন লেখক ছিলেন। ইনি সিরাজগঞ্জের (পাবনা) অধিবাসী ছিলেন এবং মেহেরুল্লাহর (যশোর) মতোই ইসলাম-প্রচারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। লোকে তাঁকে সানী (=দ্বিতীয়) মেহেরুল্লাহ্ বলে জানত। তিনি নিম্নোক্ত পুস্তিকাগুলি রচনা করেছিলেন :

১। ইসলামিক বক্তৃতামালা
২। বাল্যবিবাহের বিষময় ফল
৩। এসলাহল কওম বা সমাজ-সংস্কার
৪। মানবজীবনের কর্তব্য
৫। মহা বাক্যাবলী
৬। বাঙ্গালা কোরাণ শরীফ
৭। শ্লোকমালা
৮। উপদেশমালা
৯। হক নছিহত

অনেক সময়ে এঁর রচিত গ্রন্থাদি যশোরের মেহেরুল্লাহ্‌র লেখা বলেও ভুল করা হয়ে থাকে।

প্রায় একই সময়ে খুলনায় মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ খান নামেও একজন সমাজ-সংস্কারকামী লেখকের অস্তিত্ব ছিল। তাঁর রচিত 'ইসলাম কৌমুদী' (১৩২১) বইটিতে এই সংস্কারপন্থী চিত্তের সাহসিক অভিব্যক্তি আছে।

খ : পীর আবুবকর

সৈয়দ আহমদ বেরিলভীর শিষ্য মওলানা কেরামত আলী জৌনপুরী গুরুর সমাজ-সংস্কারকার্যে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ঘোষিত জিহাদে যোগ দেন নি। পরবর্তীকালে তিনি দৃঢ়ভাবে মতপ্রকাশ করেছিলেন যে, ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ধর্মগতভাবে অসিদ্ধ। তিনি পীর-মুরীদ সম্পর্কেরও পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পুত্র হাফিজ আহমদ ও ভাগিনেয় মুহম্মদ মহসীনের প্রচেষ্টায় তাঁর মতামত বাংলা দেশে বেশ ছড়িয়ে পড়ে। ফুরফুরার পীর আবুবক্কর (১৮৪৯-১৯৩৯) ছিলেন এই ধারার ধর্মসাধক।[১]

১। Benoy Gopal Ray, "Islam in Modern Bengal", *Visvabharati Quarterly*, XXI, I.

তাঁর উৎসাহে বাংলা ভাষায় ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত বহু পুস্তক অনূদিত ও রচিত হয়েছিল। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মপুস্তক পাঠযোগ্য নয়, এই ধরণের প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটিয়েছিলেন তিনিই। সেকালের বাঙালী মুসলমানদের সংবাদপত্রসমূহ যাতে জনপ্রিয় হয় এবং অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারে, সেদিকে তিনি যথেষ্ট দৃষ্টি রেখেছিলেন এবং প্রচুর চেষ্টাও করেছিলেন। এ প্রচেষ্টা অনেকখানি সাফল্যও লাভ করেছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের কালে হিন্দু মুসলমানে যাতে সংঘর্ষ না হয়, অথচ মুসলমানেরা যেন সরকারের কোপদৃষ্টিতে না পড়েন, এ বিষয়ে তিনি ঐকান্তিক চেষ্টা করেছিলেন। বল্কান যুদ্ধের সময়ে তুরস্কের সুলতানের সাহায্যার্থে একদিনে বিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করে তাঁর প্রভাবের পরিচয়ও তিনি রেখে গেছেন।[১]

মেহেরুল্লাহ্‌র জীবনে তাঁর প্রভাব স্পষ্টতঃই কার্যকরী হয়েছিল। যশোরের মনোহরপুরে মেহেরুল্লাহ্‌ একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মওলানা কেরামত আলীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি এর নামকরণ করেছিলেন 'মাদ্রাসায়ে কারামাতিয়া'। স্বদেশী আন্দোলনেও মেহেরুল্লাহ যোগদান করেন নি। তিনি বলেছিলেন ঃ

> একখানি ভগ্ন ও একখানি সবল পদ লইয়া পথ চলা যেমন দুষ্কর সেইরূপ শিক্ষায় দীক্ষায় যতদিন মুসলমান হিন্দুর সমকক্ষ হইতে না পারিবে, ততদিন রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুর অনুকরন করিতে যাওয়া মুসলমানের পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র।[২]

গ ঃ জমিরুদ্দীনের উপাধিপত্র

C. W. Society
N. W. P. Conference

It is hereby certified that Shaikh Zomiruddin having passed the Examination for the higher grade of Theology in the first division and having been recommended by Rev. A. E. Johnston is approved by this conference for that office.

Allahabad — A. Sterne, *Chairman.*
Dated 15th May 1893. — A. Hednight, *Secretary.*

১। মোজাম্মেল হক, মাওলানা-পরিচয় (কলিকাতা ঃ গণেশ পুস্তকালয়, ১৩২১), পৃ ৩২-৩৬ দ্রষ্টব্য।

২। হবিবর রহমান, পূর্বোক্ত, পৃ ১০৮ এ উদ্ধৃত।